শতবর্ষে ‘সন্দেশ’

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

বাঙালির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় সাল ১৩২০ বঙ্গাব্দ। এই বছরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কারণেও এই সাল বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। বৈশাখ ১৩২০ ‘সন্দেশ’ পত্রিকার আবির্ভাব। ‘ছেলেমেয়েদের জন্য সচিত্র মাসিক পত্র’ হিসেবে সে এক স্মরণীয় আত্মপ্রকাশ।

সাহিত্যিক লীলা মজুমদার (তখন রায়) তাঁর শৈশবের সেই স্মৃতি সারাজীবন আগলে রেখেছিলেন : ‘‘সৌভাগ্যক্রমে আমি সে সময়ে ঐ ২২ নং সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে উপস্থিত ছিলাম। আমার ৫ বছর বয়স।... সন্ধ্যাবেলায় ‘সন্দেশ’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি হাতে করে উপেন্দ্রকিশোর... সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে বসবার ঘরের দরজার কাছে হাসিমুখে দাঁড়ালেন। অমনি ঘরের মধ্যে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। সেই সময় সেই ঘরে যে কজন মানুষের উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল তারা কেউই বোধহয় জীবনে কখনও সে সন্ধ্যার কথা ভুলতে পারবে না।” (*গল্প-সল্প*)

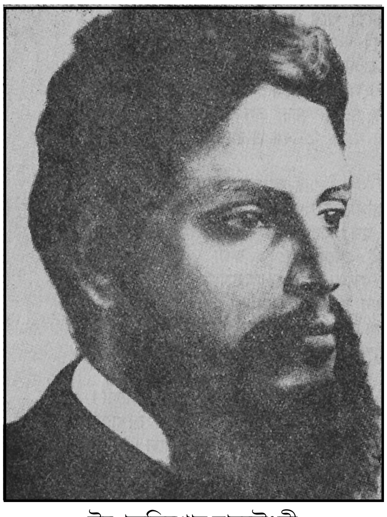

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সন্দেশ বানানোর রসুইখানাটিও আমরা এইবেলা সেই ছেলেমানুষ মেয়েটির চোখ দিয়ে চিনে নিই : ‘‘২২নং সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িটা একটু অদ্ভুত ছিল, সব সময় যেন নড়ত-চড়ত-দুলত, সারাদিন ছবির প্রুফ, লেখার প্রুফ হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ছাপাখানার লোকরা ওঠানামা করত, দুই জ্যাঠামশাই, উপেন্দ্রকিশোর আর কুলদারঞ্জন কলম হাতে লম্বা লম্বা ছাপা কাগজে মুখ গুঁজে বসে পড়তেন, কিম্বা ঈজেলে ছবির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তাঁদের কাছে কত লোকজন আসত তার ঠিক নেই।” (*আর কোনোখানে*)

প্রায় গোটা পরিবারকে সামিল করে, নিজের নতুন বাড়ির এক তলায় উপেন্দ্রকিশোর ছোটদের জন্য এক রসের ভিয়েন খুলে বসলেন।

উপেন্দ্রকিশোর পর্ব

পত্রিকার নামকরণের কারণটা সম্পাদক মশাই

পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তাঁর খুদে পাঠকদের প্রথমে জানিয়েছেন, ‘সন্দেশ’ শব্দটির ‘‘আসল অর্থ যে ‘সংবাদ’ সংস্কৃত অভিধান খুলিয়া দেখিলেই এ-কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।” তারপর প্রচলিত অর্থের খেই ধরে এক আন্তরিক আশার কথা শুনিয়েছেন, ‘‘আমরা যে সন্দেশ খাই, তাহার দুটি গুণ আছে। উহা খাইতে ভাল লাগে, আর উহাতে শরীরে বল হয়। আমাদের এই যে পত্রিকাখানি ‘সন্দেশ’ নাম লইয়া সকলের নিকটে উপস্থিত হইতেছে, ইহাতেও যদি এই দুটি গুণ থাকে,—অর্থাৎ ইহা পড়িয়া যদি সকলের ভাল লাগে আর কিছু উপকার হয়, তবেই ইহার ‘সন্দেশ’ নাম সার্থক হইবে।”

প্রথম সংখ্যা শুরু হয়েছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর কবিতা দিয়ে :

‘‘নূতন বরষে ভাই আমাদের ঘরে,
‘সন্দেশ’ এসেছে আজ নব সাজ প’রে।
ডাকিয়া লইব তারে আদরে সবাই,
হাসিমুখে ত্বরা করে আয় তোরা ভাই।”

আজ আমরা জানি, কবির সে-আহ্বান ব্যর্থ হয়নি। প্রায় প্রথম সংখ্যা থেকেই বাঙালি সন্দেশ-কে যথার্থ হাসিমুখে আপন করে নিয়েছে। কিন্তু কেন এই আদর? একশো বছরের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে নৈর্ব্যক্তিক-ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চাইলে একটা খটকা জাগা খুব স্বাভাবিক।

পূর্ববর্তী ছোটদের পত্রিকাগুলি থেকে সন্দেশ ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল যার জন্য তার পক্ষে এমন সাড়া-জাগানো আত্মপ্রকাশ সম্ভব হল?

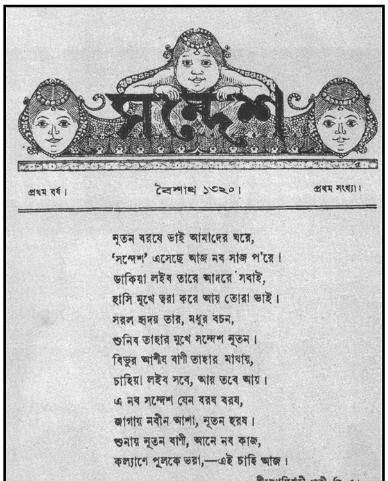

প্রথম বর্ষ। বৈশাখ ১৩২০। প্রথম সংখ্যা।

নূতন বরষে ভাই আমাদের ঘরে,
‘সন্দেশ’ এসেছে আজ নব সাজ প’রে।
ডাকিয়া লইব তারে আদরে সবাই,
হাসি মুখে ত্বরা করে আয় তোরা ভাই।
সরল হৃদয় তার, মধুর বচন,
শুনিব তাহার মুখে সন্দেশ নূতন।
বিভুর আশীষ বাণী তাহার মাথায়,
চাহিয়া লইব সবে, আয় তবে আয়।
এ নব সন্দেশ যেন বরষ বরষ,
জাগায় নবীন আশা, নূতন হরষ।
শুনায় নূতন বাণী, আনে নব কাজ,
কল্যাণে পুলকে ভরা,—এই চাহি আজ।

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী, বি, এ।

‘সন্দেশ’-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা

বাস্তবিক, সন্দেশ প্রকাশের কয়েক দশক আগে থেকেই বাংলায় ছোটদের পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। ১৮৮৩ সালে প্রমদাচরণ সেন প্রকাশ করেন ‘সখা’, ১৮৮৫-তে ঠাকুরবাড়ি থেকে বেরোয় ‘বালক’, ১৮৯৩-এ ‘সাথী’, ১৮৯৪-এ দুই পত্রিকা যুক্ত হয়ে ‘সখা ও সাথী’ এবং ১৮৯৫-এ শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত ‘মুকুল’। এর মধ্যে স্বল্পায়ু ‘বালক’-এর কথা বাদ দিলে বাকি আর সব পত্রিকার সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ‘সখা’র দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই তিনি প্রমদাচরণের সুযোগ্য সহকারী হয়ে ওঠেন। এই পত্রিকা ‘সাথী’-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি সেখানে নিয়মিত লিখেছেন। তাঁর ‘সেকালের কথা’ বইয়ের সব লেখা ‘মুকুল’-এ প্রকাশিত। তাহলে তিনি আর একটি ছোটদের পত্রিকা প্রকাশের তাগিদ বোধ করলেন কেন? বা, সেই পুরনো প্রশ্নেই ফিরে আসা যাক, সন্দেশ-কে উপেন্দ্রকিশোর এমন কী বিশেষ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করতে পারলেন?

প্রশ্নটির যদি একটিমাত্র উত্তর খুঁজে নিতে হয় তাহলে বলতে হবে, সেই বৈশিষ্ট্য হল সন্দেশ-এর মুদ্রণ প্রযুক্তি। সেকালে বই বা পত্রিকায় ছবি ছাপা হত মূলত দুটি পদ্ধতিতে : কাঠখোদাই আর লিথোগ্রাফি। ‘সখা’, ‘সাথী’, ‘মুকুল’ জাতীয় ছোটদের পত্রিকায় ছবি ছাপা হত কাঠখোদাই পদ্ধতিতে। ফটো বা হাতে আঁকা ছবির টান-টোন, রং-রেখার বুনোট এই দুই পদ্ধতির কোনওটিতেই সঠিকভাবে ছাপা যেত না। উপেন্দ্রকিশোর নিজেও ছিলেন তার ভুক্তভোগী। তাঁর ‘ছেলেদের রামায়ণ’ বইয়ের জন্য নিজের আঁকা ছবিগুলি ছাপতে গিয়ে

অলংকরণের সূক্ষ্ম মজাটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই মেধাবী উপেন্দ্রকিশোর হাফটোন পদ্ধতিতে ব্লক তৈরির গবেষণায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। তাঁর কন্যা পুণ্যলতা চক্রবর্তী তাঁর 'ছেলেবেলার দিনগুলি'-র স্মৃতিচারণ করেছেন : ''হাফটোন ছবি কি করে তৈরি করতে হয় সে বিষয়ে অনেক বই আনিয়ে বাবা পড়লেন, তারপর হাফটোন ছবি তৈরি করবার ক্যামেরা ও অন্যান্য সরঞ্জাম আনবার জন্য বিলেতে অর্ডার দিলেন... একটা ঘরে বাবা স্টুডিও তৈরি করলেন, আরেকটা ঘরে ছোট একটি ছাপার প্রেস বসল। অন্য একটা ঘরে আর বড় বারান্দায় নানারকম যন্ত্রপাতি রাখা হল। একটা স্নানের ঘরকে করা হল ডার্ক রুম।... বাবা বই পড়ে পড়ে আর নিজের হাতে তা পরীক্ষা করে সব শিখতে লাগলেন। এমনি করে আমাদের দেশে হাফটোন ছবি তৈরির সূত্রপাত হল।"

সেইসঙ্গে সূত্রপাত হল 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স' নামে উপেন্দ্রকিশোরের নিজস্ব ছাপাখানার। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকায় বিশিষ্ট শিল্পীদের আঁকা প্রচ্ছদ এবং ভেতরের ছবি এখানে ছাপা হওয়া শুরু হল। এই সংস্থার খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। আত্মবিশ্বাসী উপেন্দ্রকিশোর এবার তাঁর মুন্সিয়ানা প্রয়োগ করলেন তাঁর প্রাণের বিষয়ে : ছোটদের পত্রিকা আর তার লেখালিখি। তখনকার ব্রিটিশ ভারতে অদৃষ্টপূর্ব এই মুদ্রণসৌকর্যই সন্দেশকে ছোটদের অন্য পত্রিকা থেকে অনেকটা এগিয়ে রাখল। সন্দেশ নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে বসে পরবর্তী কালে প্রায় সকলেই বলেন উপেন্দ্রকিশোর অঙ্কিত মজাদার প্রচ্ছদ আর জীবন্ত অলঙ্করণের কথা, যা বাস্তবায়িত হত হাফটোন ব্যবহারের পারদর্শিতায়।

তবে সন্দেশ নেহাত রূপে ভোলায়নি। খুদে পাঠক আর তাদের অভিভাবকদের সে মোহিত করেছে তার গুণেও, বিচিত্র বিষয়ের আন্তরিক পরিবেশন পরিপাট্যে। কী না ছিল তার উপাদেয় আয়োজনে : গল্প, কবিতা, গান, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, ছবি, ধাঁধা। গল্পের মধ্যে রয়েছে পুরাণ, লোককথা, রূপকথা, হাসি; প্রবন্ধের মধ্যে বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, জীবনী।

বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, ''ছোটদের আশার হরিণকে দিগন্তের দিকে ছুটিয়ে দিয়ে মাসে মাসে আসত 'সন্দেশ', আসত তার আশ্চর্য মলাট আর ভিতর-বার মনোহরণ ছবি নিয়ে, আসত দুটি মলাটের মধ্যে সাহিত্যের ভোজে উজ্জ্বল পাইকা অক্ষরের পরিবেশন।... 'সন্দেশ'-এর ভোজ্য তালিকায় এমন কিছু ছিল না, যা সুস্বাদু নয়, সুপাচ্য নয়, যাতে উপভোগ্যতা আর পুষ্টিকরতার সহজ সমন্বয় ঘটেনি।" (*বাংলা শিশুসাহিত্য*) অর্থাৎ সন্দেশ-এর যে-'দুটি গুণ'-এর প্রতিশ্রুতি সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর প্রথম সংখ্যাতে দিয়েছিলেন সেটি সত্যিই পূর্ণ হল।

সন্দেশ-এর লেখকগোষ্ঠী এই প্রতিশ্রুতিরক্ষায় সাহায্য করলেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ঠাকুরবাড়ির সত্যেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, প্রমথ চৌধুরী, প্রসন্নময়ী দেবী, প্রিয়ংবদা দেবী, কালিদাস রায়, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন এক আশ্চর্য ছন্দে গাঁথা 'ইলশে গুঁড়ি' :

''ইলশে গুঁড়ি   ইলশে গুঁড়ি
ইলিশ মাছের ডিম
ইলশে গুঁড়ি   ফুলের কুঁড়ি
রোদ্দুরে রিমঝিম!"

দ্বিতীয় বর্ষ থেকে লিখতে শুরু করলেন উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র-কন্যা সুকুমার ও সুখলতা।

আলাদাভাবে আর এক নিয়মিত লেখকের কথা বলা দরকার। তিনি উপেন্দ্রকিশোরের এগারো বছরের ছোটভাই প্রমদারঞ্জন রায়। সরকারি জরিপ বিভাগের নানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি

কিস্তিতে কিস্তিতে লিখতে থাকেন 'বনের খবর'। লোকালয় থেকে বহু দূরের প্রত্যন্ত জঙ্গল, সেখানের বাঘ-হাতি-ভালুক, বার্মা-তাইল্যান্ড-অসম এলাকার সাধারণ মানুষ—এইসব জীবন্ত হয়ে উঠত তাঁর এই কলম-এ। প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত মনে করিয়ে দিয়েছেন, '' 'বনের খবর' যখন 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত হতে শুরু করে, প্রকৃতিকে সাহিত্যে উঠিয়ে নিয়ে-আসা পথিকৃৎ বিভূতিভূষণ তখনও স্কুলের গণ্ডি পার করেননি। জিম করবেট তখন বন্দুক হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন গাড়োয়াল-কুমায়ুনের বনে- পাহাড়ে। বন্দুক রেখে কলম তুলে নিতে তাঁর আরও বিশ বছর বাকি।" (*রোববার*, ১০ নভেম্বর ২০১৩)

রায়পরিবারের আর এক লেখক উপেন্দ্র-কিশোরের পরের ভাই কুলদারঞ্জন। সম্পাদনার কাজে দাদাকে সাহায্য করা ছাড়াও 'সন্দেশ'-এর আসরে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী অনুবাদক। সংস্কৃত ও বিদেশি যত গল্পের ভাবানুবাদ সেখানে প্রকাশিত হত তার প্রায় সবই কুলদারঞ্জনের। তাঁর সহজ সরল অনুবাদে 'রবীনহুড' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

তবে সবার ওপরে ছিলেন স্বয়ং সম্পাদক। পত্রিকার সব কটি বিভাগেই উপেন্দ্রকিশোর তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'ঠানদিদির বিক্রম' এবং 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' নামে তাঁর দুটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বড় গল্প সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিচিত্র বিষয় নিয়ে ছোটদের উপযোগী সরস নিবন্ধ লিখেছেন। কয়েকটি শিরোনামের উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে তাঁর আগ্রহের ব্যাপ্তি : 'লাট্টু', 'আকাশে নৌকা', 'সাপের খাওয়া', 'কাগজ', 'ডুবুরি জাহাজ', 'চোখের কথা', 'কুয়াশার কাজ'। কিছু লেখা আবার লিখেছেন স্পষ্টত শিশু পাঠকের অভিভাবকদের কথা ভেবেও। প্রথম সংখ্যাতেই 'শিশু' শিরোনামে তিনি লিখেছেন শৈশবে তৈরি হওয়া ভাষাবোধ নিয়ে : ''খোকার নাম 'সুকুমার'; সে কথা তাহার মুখে আসে না, সে বলে 'কুতুমাম'। চাকর লছমনকে সে বলে 'বুথুমাম'; রামভজনের নাম রাখিয়াছে 'ভজাজ্জা'। অনেক সময় অক্ষর মুখে আসিলেও কোনটা আগে কোনটা পরে ঠিক থাকে না। তখন 'টুপি' হয় 'পুটি', 'বেগুন' হয় 'গেবুন',...।" আগে তাঁর কাব্যপ্রতিভার পরিচয় তেমনভাবে জানা না গেলেও সন্দেশ-এর জন্য তিনি কিছু উপভোগ্য পদ্যও রচনা করেছেন। এমনকী ধাঁধা রচনাতেও উপেন্দ্রকিশোর তাঁর প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন।

আর উল্লেখ করতে হবে চিত্রশিল্পী উপেন্দ্রকিশোরের কথা। প্রতি বছর নতুন নতুন প্রচ্ছদ, প্রচ্ছদের পরের আর্ট পেপারে প্রতি সংখ্যায় একটি করে ছবি এবং পাতায় পাতায় অলংকরণ। সত্যজিৎ রায় এই ছবিগুলির মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন, ''একদিকে বিলিতি একাডেমিক শিল্পের প্রভাব, অন্যদিকে জাপানি উডকাট, রাজপুত ও মুঘল মিনিয়েচার ও বাংলার লোকশিল্প এবং আরও অন্যদিকে তাঁর নিজস্ব অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তি সব মিলে এমন একটি ভঙ্গির উদ্ভব হয়েছিল যা উপেন্দ্রকিশোরের নিজস্ব ভঙ্গি এবং যার ফলে তাঁর ছবি দেখলে কখনোই অন্য লোকের আঁকা বলে ভুল হতো না।"

সম্পাদকের বহুমুখী প্রতিভা তাই সন্দেশকে প্রতি মাসে নিত্যনতুন স্বাদে অনন্য করে তুলত। এর সঙ্গে যুক্ত হত সম্পাদকীয় উদারতা আর নেতৃত্ববোধ। লীলা মজুমদার জানিয়েছেন, ''লেখকরা লেখা দিতেন বিনামূল্যে। সম্পাদকমশাই মাসকাবারে হিসাব মেলাবার সময় প্রসন্নচিত্তে ট্যাঁক থেকে অনেকগুলো টাকা গচ্ছা দিতেন। এমন ভালো কাজে টাকা খরচ করতে পারাটাও যেন মস্ত সৌভাগ্য।"

কিন্তু এমন আনন্দযজ্ঞে খুব বেশিদিন সামিল থাকা আর সম্ভব হল না উপেন্দ্রকিশোরের। ট্যাঁকে

সুকুমার রায়ের অলংকরণ

টান পড়ার জন্য নয়। টান পড়ল শরীরে। ''উপেন্দ্রকিশোরের বাহান্ন বছর বয়স, কিছুদিন থেকে শরীর ভাঙতে শুরু করেছে। ডাইবিটিস রোগ, চিনি খাওয়া বারণ, একমাত্র ভালো ওষুধ ইনসুলিন সে তখনও বার হয়নি। অন্য যা ছিল সে পাওয়া ক্রমে কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, যুদ্ধের জন্য চালান বন্ধ। যে মানুষটা চিরকাল নিজেই সব কাজ করে এসেছেন, তিনি এবার 'সন্দেশে'-র ভার দিলেন সুকুমার সুবিনয়ের উপরে।" (*উপেন্দ্রকিশোর*, লীলা মজুমদার)

তেত্রিশটি সংখ্যা সম্পাদনাশেষে সন্দেশকে এক নির্দিষ্ট তাল-লয়-সুর-এ বেঁধে দিয়ে বিদায় নিলেন তার সৃষ্টিকর্তা উপেন্দ্রকিশোর।

সুকুমার-সুবিনয় পর্ব

বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক সুনির্মল বসু তাঁর শৈশবে সন্দেশ-পাঠের স্মৃতিচারণ করেছেন : '' 'সন্দেশ'-এর আর একটি প্রবল আকর্ষণ ছিল। কে একজন বেনামে 'সন্দেশ'-এ মজার মজার গল্প কবিতা লিখতেন। এত সুন্দর লেখা যে কার আমরা বুঝতে পারতাম না। পাগলা দাশু প্রভৃতি অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর গল্প আর বোম্বাগড়ের রাজা, রামগরুড়ের ছানা প্রভৃতি সচিত্র কবিতাগুলি যে কার মাথা থেকে বার হচ্ছে আমরা বন্ধুরা অনেক আলোচনা করেও তা স্থির করতে পারতাম না।

''... কে একজন বলল, রবিঠাকুর ওই সব গল্প কবিতা লেখেন আমি জানি। কেউ বললে—U.R নামে ওই আর্টিস্টেরই এই সব লেখা—সমস্যার আর সমাধান হয় না।" (*জীবনখাতার কয়েক পাতা*)

'সন্দেশ'-এ রায় পরিবারের অনেকের লেখাই বিনা নামে অনেক সময় প্রকাশিত হত, তাই এই সংশয়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-তথ্যটি এই স্মৃতিচারণ থেকে জানা যাচ্ছে সেটি হল, U.R বা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সম্পাদক থাকাকালীনই সন্দেশ-পাঠকগোষ্ঠী সুকুমারের খেয়াল-রসে মশগুল।

সন্দেশ-এর সঙ্গে সুকুমারের যোগাযোগ ঘটেছিল কয়েক সংখ্যা দেরিতে। কারণ প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সময় তিনি রয়েছেন ইংল্যান্ডে মুদ্রণ-শিল্পে উচ্চশিক্ষার জন্য। বিলেত থেকেই তিনি কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'ভবম হাজাম' গল্পের সঙ্গে ছবি এঁকে পাঠান। লেখাপড়া শেষ করে অক্টোবর ১৯১৩ কলকাতায় ফেরার পর থেকেই তিনি সন্দেশ-এর নিয়মিত লেখক। ওইবছরেই অগ্রহায়ণ ১৩২০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'বেজায় রাগ'। দ্বিতীয় বর্ষ দশম সংখ্যায় প্রকাশিত হল 'খিচুড়ি'। এই পদ্য দিয়েই তাঁর 'আবোল তাবোল' পর্বে প্রবেশ। বাঙালি পাঠক শুনল এক উদ্ভট কাব্যকথা :

''হাঁস ছিল—সজারুও (ব্যাকরণ মানি না)
হয়ে গেল হাঁসজারু কেমনে তা জানি না।"

পরের সংখ্যাতেই বেরোল 'কাঠবুড়ো'-র কথা :

''হাঁড়ি নিয়ে দাড়ি মুখো কে-যেন কে বৃদ্ধ,
রোদে ব'সে চেটে খায় ভিজে কাঠ-সিদ্ধ।"

সন্দেশ-পাঠক এই 'আজগুবি চাল', 'বেঠিক বেতাল' জগতের স্রষ্টাকে সাদরে বরণ করে নিল।

তাই উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর সন্দেশ-কে এগিয়ে নিয়ে যেতে সুকুমারের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। পিতার জীবনের শেষ পর্বে তিনি সম্পাদনার কাজে অনেকটাই হাত লাগাতেন। ফলে সেই অভিজ্ঞতাও তাঁর কাজে এল। সঙ্গে যোগ্য সহকারী পেলেন মেজোভাই সুবিনয়কে। লেখকগোষ্ঠীতে

পুরনোদের সঙ্গে যোগ দিলেন প্রবীণ-নবীন আরও অনেকে, রায়পরিবারের মধ্য থেকেও, বাইরে থেকেও।

সুকুমারের সম্পাদনাকালে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ‘বৃষ্টি ও রৌদ্র’ আর ‘সময়হারা’, অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন ‘খাতাঞ্চীর খাতা’, সীতা দেবী ‘নিরেট গুরুর কাহিনী’, প্রিয়ম্বদা দেবী ‘পঞ্চুলাল’, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘পালকির গান’, অতুলপ্রসাদ ‘বাতাসের গান’। এছাড়াও এই পর্বে সন্দেশ-এ লিখেছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার, কালিদাস রায়, কাজি নজরুল ইসলাম, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রমথনাথ চৌধুরী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ। রায়পরিবারের লেখকদের মধ্যে সুকুমারের দুই কাকা কুলদারঞ্জন ও প্রমদারঞ্জন, দিদি সুখলতা, ভাই সুবিনয় তো ছিলেনই। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন আরও অনেক প্রতিভাবান : সুকুমারের মেজোবোন পুণ্যলতা, ছোটবোন শান্তিলতা, ছোটভাই সুবিমল, মাসি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, মায়ের মামা ডা. দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (‘মেজদাদামশাই’ ছদ্মনামে), কুলদারঞ্জনের দুই মেয়ে মাধুরীলতা ও ইলা, সুবিনয়ের স্ত্রী পুষ্পলতা। এমনকী প্রমদারঞ্জনের চোদ্দো বছরের মেয়ে লীলা (ভবিষ্যতের লীলা মজুমদার)-কে দিয়ে সুকুমার ‘লক্ষ্মী ছেলে’ নামে এক উপভোগ্য গল্প লিখিয়ে নিয়েছিলেন।

এই চাঁদের হাটে সুকুমার সন্দেশ-এর ভিয়েন বসিয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্য সমগ্রের ভূমিকায় সত্যজিৎ রায় লিখেছেন, ‘‘সন্দেশের ভার স্কন্ধে ন্যস্ত হবার পর থেকেই সুকুমারের শিশুসাহিত্য সৃষ্টি দিনে দিনে বেড়ে চলে। শুধু গল্প কবিতা নয়; নানান বিষয়ে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ, সারা বিশ্বের খুঁটিনাটি খবর, দেশ-বিদেশের উপকথা, স্বরচিত ধাঁধা, হেঁয়ালি ইত্যাদিতে সন্দেশের পাতা ভরে ওঠে। এই সময়কার সন্দেশের যে-কোনো একটি

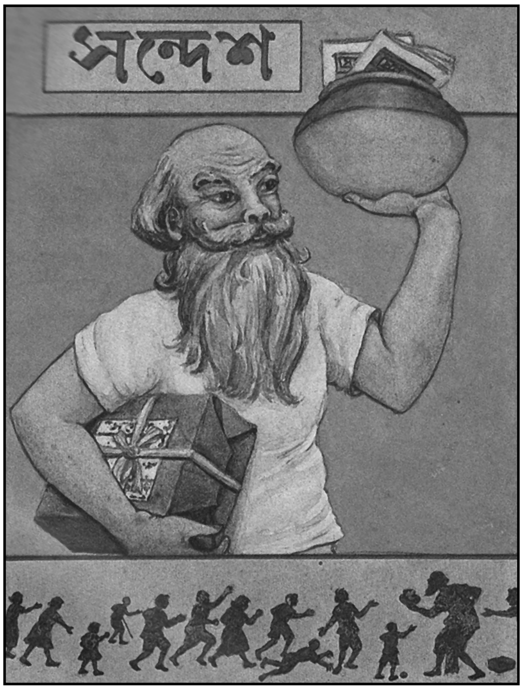

সুকুমার রায়ের আঁকা সন্দেশের প্রচ্ছদ

সংখ্যা তুলে নিয়ে তার উপাদান বিশ্লেষণ করলে তা থেকে সার্থক শিশুসাহিত্যের কয়েকটি চিরন্তন সংজ্ঞার নির্দেশ পাওয়া যায়।’’ অথচ সেখানে কোথাও জ্ঞান ফলাবার, গম্ভীর মুখে উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা নেই। সুকুমার ‘স্কুল স্টোরি’-র যাবতীয় প্রচলিত ছাঁচ ভেঙে নির্দ্বিধায় লিখে দিলেন : ‘‘একদিন বেহারীলাল পড়ার সময় পড়িয়াছিল, সেজন্য আমরা পরে চাঁদা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিয়াছিলাম।’’

লেখার সঙ্গে রয়েছে সুকুমারের অলংকরণ—নিজের লেখার সঙ্গে, অন্যের লেখার সঙ্গেও। তাঁর ছবি দেখে বোঝার উপায় নেই, চিত্রাঙ্কনে তাঁর কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। তাঁর হেড অফিসের বড়বাবু, রামগরুড়, হিজিবিজ্‌বিজ্‌ বা গোমড়াথেরিয়াম সবাই আশ্চর্য জীবন্ত আর বিশ্বাসযোগ্য।

নলিনী দাশ সুকুমার-পর্বের এক সংহত বর্ণনা

দিয়েছেন : ‘‘সুকুমার রায়ের সম্পাদনায় ‘সন্দেশ’-এ বিভিন্ন পশুপাখি, জীবজন্তু আর প্রাকৃতিক ঘটনার চিত্তাকর্ষক রঙিন ছবি আর ফোটো গুরুত্ব পেয়েছিল, অনেক সময়ে প্রথম পাতাতেই ছাপা হত। সমুদ্রের ফুল, বিচিত্র বর্ণের শঙ্খ, সমুদ্রের তলায় আশ্চর্য বাগান, উজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি, শুকপাখি, সূর্যের পূর্ণগ্রহণ, ক্রাকাতোয়ার অগ্নিকাণ্ড এসবের এমন চমৎকার ছবি ‘সন্দেশ’-এ বেরিয়েছিল যেরকম আজ পর্যন্ত নামী বিলেতি পত্রিকায় ছাড়া দেখা যায় না। ছবি দেখেই তরুণ পাঠকের মন সে বিষয়ে প্রবন্ধটির প্রতি আকৃষ্ট হতো। আর ফোটো আর রেখাচিত্রের সাহায্যে সে-সব প্রবন্ধ মনোমুগ্ধকর ছিল। উপেন্দ্রকিশোরের মতো সুকুমার রায়ও নিজের লেখা ছাড়া অন্যের লেখা গল্প-কবিতা- প্রবন্ধের সঙ্গে ছবি এঁকেছেন, ফোটো সংগ্রহ করে ছেপেছেন। সুন্দর আর মজার বিলেতি ছবি ছাপাতেন। সঙ্গে কয়েক লাইনের মজার ছড়াও লিখে দিতেন।’’

সুকুমার রায়

সুকুমার সাকুল্যে আট বছর—১৯১৫ থেকে ১৯২৩ সন্দেশ-এর সম্পাদক থাকার সুযোগ পেয়েছেন। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে সে-সময়ের দুরারোগ্য কালাজ্বরে তিনি মারা যান। মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত রোগশয্যায় তিনি সন্দেশ এবং তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই ‘আবোল তাবোল’-এর পাতা সাজিয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর ঠিক নয় দিন পর প্রকাশিত হল তাঁর সেই চিরকালীন বই। তার শেষ পাতার শেষ চার ছত্রে তাঁর অকাল বিদায়ের সুর রসিকতায় সমুজ্জ্বল :

‘‘আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।’’

তবে সাঙ্গ হয়নি সন্দেশ-এর পালা। সুকুমারের যোগ্য সহযোগী, তাঁর ভাই সুবিনয় অনেক কষ্ট করে আরও প্রায় দুবছর সন্দেশ চালিয়েছিলেন। কিন্তু ততদিনে দেনার দায়ে বিক্রি করে দিতে হয় ইউ রয় অ্যান্ড সন্স-এর ছাপাখানা, সঙ্গে সন্দেশ পত্রিকার স্বত্ব। এমনকী বিক্রি হয়ে যায় রায় পরিবারের বসতবাড়িটিও। ফলে সন্দেশ প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

কিছু বছর বিরতির পর নতুন স্বত্বাধিকারীরা সুবিনয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে সুধাবিন্দু বিশ্বাসকে যুগ্ম সম্পাদক করে আবার সন্দেশ প্রকাশ শুরু করেন খুব সম্ভব ১৩৩৮-এর আশ্বিনে এবং কিছু সংখ্যা বেরনোর পরই এই উদ্যোগ থমকে দাঁড়ায়। এই পর্যায়ে প্রমদারঞ্জনের ‘বনের খবর’ আবার কয়েক কিস্তি প্রকাশ পায়।

সত্যজিৎ রায় তাঁর শৈশবে দেখা সন্দেশ-এর এই দ্বিতীয় পর্যায় সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন : ‘‘মলাটে তিনরঙা ছবি, হাতি দাঁড়িয়ে আছে দু’পায়ে, শুঁড়ে ব্যালান্স করা সন্দেশের হাঁড়ি। এই সন্দেশেই ধারাবাহিকভাবে প্রথম সংখ্যা থেকে বেরোয় রবীন্দ্রনাথের ‘সে’।’’

নবপর্যায়

সন্দেশ কিন্তু ‘শেষ হয়ে হইল না শেষ’। বরং প্রায় তিরিশ বছরের ব্যবধানে সে নতুন জীবনীশক্তিতে আবার নতুন করে শুরু করল তার পথ চলা। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় একদিন গল্প করতে করতে হঠাৎ বন্ধু সত্যজিৎ রায়ের কাছে

কথাটা তোলেন এবং দুজনেই লেগে পড়েন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে। সাময়িকভাবে ধর্মতলায় পত্রিকা দপ্তর করা হল। উৎসাহ দিলেন অনেকেই। সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেন সুকুমার-পত্নী সুপ্রভা রায়। তিনি আন্তরিকভাবে চাইতেন, পুত্র সত্যজিৎ তার পিতৃপুরুষের আরব্ধ কাজ কাঁধে তুলে নিক।

শুধু সম্পাদনা আর অলংকরণের দায়িত্ব নয়। এই পর্বে সন্দেশ-এর প্রথম কিছু সংখ্যার আর্থিক দায়ভারও নেন সত্যজিৎ। তিনি তখন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক। সেই সময় 'তিন কন্যা' এবং রবীন্দ্রনাথের ওপর এক ঘণ্টার এক তথ্যচিত্র নির্মাণে ব্যস্ত। কিন্তু তাতে সন্দেশ প্রস্তুতিতে কোনও ঢিলে দেওয়া হল না। দুই বন্ধুর ঐকান্তিক চেষ্টায় ও যুগ্ম সম্পাদনায় ১৩৬৮-র শুরু থেকে মাসে মাসে প্রকাশিত হতে শুরু করল সন্দেশ। গোটা দেশ তখন রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পালনে ব্যস্ত।

সন্দেশ নবপর্যায় প্রথম সংখ্যায় পুণ্যলতা চক্রবর্তী ভূমিকা লিখলেন : "এতদিন পরে সন্দেশ আবার এসেছে—কত আশা আর আনন্দের সঙ্গে তাকে আদরে বরণ করছি। আবার সন্দেশ ঘরে ঘরে নির্মল হাসি ও আনন্দের ভাণ্ডার খুলে দিক, হাসি ও আনন্দের মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েদের জ্ঞান বুদ্ধি ফুটিয়ে তুলুক, তাদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত করে দিক।" আজ, নবপর্যায় সন্দেশ টানা অর্ধশতাব্দী চলে আসার পর, স্বীকার করতেই হয়, সে-কামনা পূরণ হয়েছে। সন্দেশের বহিরঙ্গে অনেক পরিবর্তন হয়েছে—কখনও প্রযুক্তির কারণে, কখনও আর্থিক বাধ্য-বাধকতায়, ১৯৭০-৭৩ দ্বিমাসিক ট্যাবলয়েড হিসেবে বেরিয়ে সন্দেশ আবার বেরতে থাকে মাসে মাসে তার পুরোনো চেহারায়। বারে বারে বদল হয়েছে তার সম্পাদকও। কিন্তু পুণ্যলতা-কথিত সেই মূল লক্ষ্য থেকে সন্দেশ কখনও চ্যুত হয়নি।

'সন্দেশ'-এর কয়েকটি পুরনো প্রচ্ছদ

আপাতত সম্পাদক পরিবর্তনের বিষয়টি বলে নেওয়া যাক। বছর খানেকের মধ্যেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে আর সন্দেশ সম্পাদনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাঁর জায়গায় এলেন রায় পরিবারের বিশিষ্ট লেখিকা লীলা মজুমদার। টানা বেশ কিছু বছর সন্দেশ সম্পাদক হিসেবে লীলা মজুমদার আর সত্যজিৎ রায়ের নাম প্রকাশিত হলেও, আদতে ছিলেন এক তৃতীয় সম্পাদকও, যাঁর নাম ১৯৭৫ থেকে মুদ্রিত করা শুরু হয়। তিনিও রায় পরিবারেরই এক গুণী সদস্যা, পুণ্যলতা চক্রবর্তীর কন্যা নলিনী দাশ। তিনি তখন বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা। অশোকানন্দ দাশ তাঁর স্বামী, সন্দেশের প্রকাশক। ধর্মতলা থেকে সরিয়ে তাঁদের রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর বাড়িতেই বসানো হল সন্দেশের দপ্তর। তিন সম্পাদক ও অশোকানন্দের যৌথ অভিভাবকত্বেই আসে নবপর্যায় সন্দেশের স্বর্ণযুগ। প্রায় তিন দশক এইভাবে চলার পর অল্প সময়ের ব্যবধানে একে একে মারা যান অশোকানন্দ, সত্যজিৎ এবং নলিনী দাশ। অসুস্থ লীলা মজুমদারের সঙ্গে সন্দেশ সম্পাদনার দায়িত্ব যুগ্মভাবে গ্রহণ করেন সত্যজিৎ-পত্নী বিজয়া রায়। কিন্তু শারীরিক কারণে দুজনের পক্ষেই এই দায়িত্ব বেশিদিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। দায়িত্ব পান সত্যজিৎ-পুত্র সন্দীপ রায়। ‘ফোর্ড ফাউন্ডেশন’-এর আর্থিক সহায়তা এই সময় সন্দেশকে কিছুটা স্বস্তি দেয়। পরে সন্দীপের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন সুজয় সোম এবং পরে প্রণব মুখোপাধ্যায়। এঁরা দুজনেই দীর্ঘকালের ‘সন্দেশী’ লেখক।

একের পর এক অত্যন্ত সক্ষম এবং দায়বদ্ধ ‘সন্দেশী’ লেখকের পৃষ্ঠপোষকতা এই পত্রিকা তার জন্মলগ্ন থেকেই পেয়ে আসছে। নবপর্যায়ের সন্দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রথম দুবছরে লিখলেন সেই সময়ের প্রথম সারির সাহিত্যিকরা : শিবরাম চক্রবর্তী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সৈয়দ মুজতবা আলী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তৃতীয় বছরে বেরতে শুরু করল দু-দুটি ধারাবাহিক উপন্যাস : প্রিয়ম্বদা দেবীর ‘পঞ্চুলাল’ এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদারের যুগ্ম লেখনীতে ‘হট্টমালার দেশে’।

একে একে লিখতে লাগলেন সেই সময়ের উদীয়মান, জনপ্রিয় লেখকেরা এবং ক্রমে তাঁরা সন্দেশের নিয়মিত লেখক হয়ে উঠলেন : আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, গৌরী ধর্মপাল, বুদ্ধদেব গুহ, সরল দে প্রমুখ।

কিন্তু সন্দেশের লেখকগোষ্ঠীর কথা বলতে গেলে আলাদা করে উল্লেখ করতে হবে এই পত্রিকার একান্ত নিজের লেখকদের কথা। অর্থাৎ যাঁরা কমবয়সী পাঠক হিসেবে সন্দেশকে চিনেছেন, তারপর সেখানে লেখা শুরু করেছেন এবং ধীরে ধীরে এই পত্রিকার শুধু নিয়মিত লেখক হননি, সন্দেশ পরিবারেরই সদস্য হয়ে উঠেছেন। এমনকী এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সন্দেশ ছাড়া বিশেষ আর কোনও পত্রিকায় লেখেনওনি। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুকুমার রায়ের ছোটভাই সুবিমল রায়, শিবানী রায়চৌধুরী, রেবন্ত গোস্বামী, শিশিরকুমার মজুমদার, অজেয় রায়, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। নিয়মিত ব্যবধানে প্রকাশিত হত লীলা মজুমদারের স্মৃতিচারণমূলক ‘গল্প সল্প’, নলিনী দাশের ‘গণ্ডালুর রহস্য-অ্যাডভেঞ্চার’, সদ্য পড়তে-শেখা বাচ্চাদের জন্য পুণ্যলতা চক্রবর্তীর আশ্চর্য সিরিজ ‘ছোট্টদের জন্য ছোট্ট গল্প’।

আর দুটি নিয়মিত বিভাগের কথা না বললে সন্দেশের বৈশিষ্ট্য বর্ণন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। একটি পত্রিকার খুদে গ্রাহকদের লেখা-রেখার নির্বাচিত সংকলন ‘হাত পাকাবার আসর’। আর

দ্বিতীয়টি 'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর', লেখক জীবন সর্দার। অবশ্যই এটি একটি ছদ্মনাম। রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' নাটক থেকে নামটা বেছে দিয়েছিলেন কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। এই বিভাগে লেখক লিখতেন প্রকৃতি বিষয়ক তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। নিজে জলে-জঙ্গলে, বনে-বাদাড়ে, ঘুরে বেড়াতেন উদগ্রীব চোখ-কান-নাক সম্বল করে আর যা দেখতেন-শুনতেন-শুঁকতেন সব লিখে রাখতেন এক 'মেঠো খসড়া'-য়। লিখতেন মজা পুকুরের পোকাদের কথা, মেঠো শেয়ালের কথা, এলেমেলো পাতার কথা। সেই খসড়া থেকে তৈরি হত জীবন সর্দারের ছোট ছোট লেখা।

লীলা মজুমদার সন্দেশের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "ছোটদের দেখাতে চাই এই জীবনটা কত ভালো। জানাতে চাই ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কি ঘটেছে, ঘটছে, ঘটতে যাচ্ছে। মানুষের মত মানুষ দেখাতে চাই। এমন মানুষ যাদের সাহস আছে, যারা ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ বলে। যারা দলাদলির বাইরে; যারা ঘৃণা করে শুধু মিথ্যাকে, আর নিষ্ঠুরতাকে আর কুঁড়েমিকে। বাদ দেয় যত রাজ্যের ন্যাকামি আর ঢং। যারা বিশ্ব-প্রকৃতিকে তার ন্যায্য জায়গা দিতে প্রস্তুত, যাদের মন উদার। এত সবের সঙ্গে আমরা পাঠকদের খুশি-ও করতে চাই। খুশি করতে না পারলে আমাদের সব চেষ্টাই বৃথা হবে।" (*সেরা সন্দেশ*)

এত কিছু পরিবেশনের মতো মন আর কলম আছে যে-তরুণ লেখকদের, সন্দেশ সম্পাদকদের জহুরি চোখ তাদের ঠিক খুঁজে নিত। তারপর, তাদের উৎসাহ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, প্রয়োজনে লেখা সংশোধন করে, তাঁরা তাদের প্রস্তুত করে তুলতেন। নতুন লেখকদের প্রতি লীলা মজুমদারের পরামর্শ ছিল, লেখাকে বারবার ঘষামাজা করে, ছেঁটে ছোট করার। লেখার এই পরিশোধন পর্ব, তাঁর ভাষায় জাপানি ইকেবানা তৈরির মতো। ছেঁটে, বদলে, সরিয়ে নড়িয়ে এমন এক নিখুঁত পর্যায়ে পৌঁছতে হবে, যখন গল্পের একটি শব্দ বা ইকেবানার একটি টুকরোও বাড়ালে-কমালে যেন খুঁত এসে যাবে। তৈরি হত নতুন নতুন 'সন্দেশী' লেখক, যাঁদের কয়েকজনের নাম আমরা খানিক আগেই করেছি।

নতুন লেখকদের পথ দেখাতেন সত্যজিৎ রায়ও। নিজের ব্যস্ত কর্মসূচির মাঝেও সময় করে তিনি লেখার ওপর কলম চালাতেন, সরাসরি লেখককে কিছু অদল-বদল করে নতুন করে লিখে দেওয়ার পরামর্শ দিতেন। শারদীয় দেশ ১৪১৯-এ অজেয় রায়কে লেখা সত্যজিৎ রায়ের কিছু পুরনো চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট—কতটা সময়, ধৈর্য আর দরদ দিয়ে সত্যজিৎ নবীন লেখকদের লেখা যথার্থ অর্থে সম্পাদনা করতেন।

শুধু লেখক নয়, সন্দেশ-এর নবীন অলংকরণ শিল্পীদের কাছেও সত্যজিৎ এক অভিভাবকস্বরূপ। তাঁর আগের দুই প্রজন্মের ঐতিহ্য মেনে সন্দেশকে ছবিতে ছবিতে আকর্ষণীয় করে তোলার মূল দায়িত্ব নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে। সেই সঙ্গে তৈরি করে গেছেন নতুন প্রজন্মের এক ঝাঁক কুশলী শিল্পীকে : উজ্জ্বল চক্রবর্তী, সুবীর রায়, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, দেবাশিস দেব, প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু চাকী, পার্থ দাস, সমীর দাস প্রমুখ।

এবার আসি সেই মূল প্রশ্নে। উপেন্দ্রকিশোর পর্বে আমরা সন্দেশের জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলাম তার মুদ্রণ সৌকর্যকে। কিন্তু নবপর্যায় সন্দেশের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ছিল বেশ কয়েকটি বাণিজ্য-সফল পত্রিকা। প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা, জনপ্রিয় লেখকদের অংশগ্রহণ, বিজ্ঞাপনি অর্থাগম, মুদ্রণ পারিপাট্য—সমস্ত দিক থেকেই তারা সন্দেশের থেকে দু-এক কদম এগিয়ে ছিল। অথচ তা সত্ত্বেও নবপর্যায়ের সন্দেশ যে তার প্রথম তিন দশকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল তার পেছনে সবচেয়ে বড় জোরের

জায়গাটি তাহলে কোথায়? বা, যদি এই বিপুল পাঠকপ্রিয়তার পেছনে একটিমাত্র কারণকে বেছে নিতে হয় সেটি কী?

নির্দ্বিধায় বলা যাক, সেটি হল সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি : তাঁর গল্প, তাঁর শঙ্কু, তাঁর ফেলুদা, তাঁর ছবি, তাঁর প্রচ্ছদ এবং সর্বোপরি বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে তাঁর আকাশচুম্বী ইমেজ। ভাবতে অবাক লাগে, সন্দেশ নতুন করে প্রকাশ করতে উদ্যোগী না হলে আমরা হয়তো সাহিত্যিক সত্যজিৎকে পেতামই না। তিনি নিজেই তাঁর সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্মৃতিচারণ করেছেন : ''আমার চল্লিশ বছর বয়সে আমি প্রথম লিখতে শুরু করি। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ—কিছুই লেখার কোনও তাগিদ আমি এর আগে অনুভব করিনি। বিজ্ঞাপনের নকশা করি, বইয়ের মলাট আঁকি, ছবি আঁকি, বছরে একটা করে ফিল্ম করি—এই ছিল কাজ। এই সময় একদিন আমার বন্ধু কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আড্ডার ফাঁকে প্রশ্ন তুললেন সন্দেশ পত্রিকা নতুন করে বার করলে কেমন হয়। আমি সোৎসাহে সমর্থন করি। কয়েক মাসের মধ্যেই নতুন পর্যায়ের প্রথম সংখ্যা সন্দেশ প্রকাশিত হল। আমার মাথায় তখনও নতুন কিছু আসেনি, অথচ দুজনের একজন সম্পাদক হিসাবে আমার কিছু লেখা দরকার, তাই এডওয়র্ড লিয়রের ছড়া অনুবাদ (মূল 'জ্যাবারওয়াকি' থেকে 'জবরখাকি') করলাম। সন্দেশের চাহিদা মেটাতেই আমি গল্প লেখা শুরু করি। ফেলুদার গল্প, শঙ্কু'র ডায়রি, সবই প্রথম সন্দেশেই বেরোয়। সেই সঙ্গে ছড়া, প্রবন্ধ ইত্যাদিও লেখা শুরু হয়। সেই থেকে আর থামিনি।" (*সেরা সত্যজিৎ*)

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। জনপ্রিয় লেখক সত্যজিৎ সেইসময় বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকার লোভনীয় হাতছানি উপেক্ষা করে, আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও সন্দেশে নিয়মিত লিখে গিয়েছেন, সময় দিয়েছেন, শ্রম দিয়েছেন। এর পেছনে ছিল সন্দেশকে প্রতিষ্ঠিত করার আকুতি, উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমারের অসম্পূর্ণ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার আগ্রহ।

শিশুসাহিত্যের প্রতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সন্দেশ-সম্পাদকদের এই আন্তরিকতাই এই পত্রিকাকে এত বছর ধরে সজীব রেখেছে, সঞ্জীবিত রেখেছে। অন্যতম সম্পাদক লীলা মজুমদারের ভাষায় : ''আমাদের তরুণ পাঠকদের হাসাতে চেষ্টা করেছি; না হাসলে কেউ বাঁচে? ভাবাতে চেষ্টা করেছি; না ভাবলে কেউ চোখ মেলে কিছু দেখতে পায়? এই সুন্দর পৃথিবীটাকে আর চারদিকের বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে দেখতে, কল্পনা করতে, দেখে দেখে উপভোগ করতে বলেছি। আশা করেছি তারো পরে আরো যা আছে, সেটি তারা নিজেরাই খুঁজে নিতে পারবে।" (*সেরা সন্দেশ*)

সত্যি, সন্দেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে অল্পবয়সি বাঙালিকে দেখতে শিখিয়েছে, চিনতে শিখিয়েছে, খুঁজে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। শতেক বছরের সন্দেশের কাছে তাই আমাদের অপরিশোধ্য ঋণ।

সহায়ক গ্রন্থ

১। খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *শতাব্দীর শিশুসাহিত্য* (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯)

২। সুস্মিতা দত্ত, *প্রসঙ্গ সন্দেশ : উপেন্দ্রকিশোর সম্পাদনা পর্ব* (পারুল প্রকাশনী, ২০১০)

৩। *সুকুমার সাহিত্য সমগ্র* (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৩), খণ্ড ১

৪। *সেরা সন্দেশ* ১৩৬৮-১৩৮৭। (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৮৮)

৫। *সন্দেশ : সত্যজিৎ রায় স্মরণ সংখ্যা।* শ্রাবণ ১৩৯৯

৬। কোরক পত্রিকার তিনটি বিশেষ সংখ্যা : উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, লীলা মজুমদার

৭। রোববার : সন্দেশ সংখ্যা। *সংবাদ প্রতিদিন*, ১০ নভেম্বর ২০১৩